যুদ্ধ জয়ের গল্প

বীর মুক্তিযোদ্ধা গাজী আলী আজগর

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ, ১৯৭১। মুক্তিপাগল ১০ লাখ মানুষ একটি উদ্দেশ্য মিলিত হয়েছে ঐতিহাসিক রেসকোর্স (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) ময়দানে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, আপস- না- সংগ্রাম সংগ্রাম,জনতার সংগ্রাম আলবেই চলবেই, পিন্ডি না- ঢাকা ঢাকা, তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ, জিন্নাহ মিয়ার পাকিস্তান - আজিমপুরের গোরস্তান, বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো- এমনই হাজারো ¯ùাগানে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। লাখো জনতার হাতে লাঠি আর গগনবিদারী ¯ùাগানে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। সেই উত্তাল মানুষের সমুদ্রে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিকাল ৩ টা ২০ মিনিটে সভামঞ্চে এসে কোন রকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে দিলেন এক ঐতিহাসিক ভাষণ। ৭০ এর নির্বাচনে বিজয়ের পর এটাই হলো আনুষ্ঠানিক কোন জনসভায় তাঁর ভাষণ।১৯ মিনিটের এই কালজয়ী ভাষণের মাধ্যমে তিনি বাঙালী জাতীয় ভবিষ্যতের চিত্র এঁকে দিলেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত পাকিস্তানের ২৩ বছরের শোষণ - বঞ্চনার ইতিহাস, দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখার মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা এবং শেষে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করা।তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন " এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।জয় বাংলা। "- বলে।

পঞ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপর যে সমস্ত অসম্মানজনক আচরণ ও বৈষম্য করেছে তা লেখে শেষ করা যাবে না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা যিনি বিশ্বনেতার আসনে সমাসীন ছিলেন সেই বঙ্গবন্ধুকে কারণে অকারণে অসম্মানসহ অধিকাংশ সময়ে জেলে আটকে রেখেছে।ততকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা যে সব বৈষম্য করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত হিসেব আমারা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিলেট ডিভিশনের সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের লেখায় পাই।তিনি লিখেছেন " পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ৭ হাজার ৬৪০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক ঋণ পেয়ে তার ৮৪ শতাংশ ব্যয় করেছিলো পঞ্চম পাকিস্তানে আর ৩০ শতাংশের কম ব্যয় করা হয়েছিলো পূর্ব পাকিস্তানে।১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছিলো ২৫ হাজার ৫৫৯ বিলিয়ন টাকা।অপর দিকে একই সময়ে পঞ্চিম পাকিস্তান থেকে পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছিলো ২১ হাজার ১৩৭ মিলিয়ন টাকা। সে সময় সোনালি আঁশখ্যাত আমাদের দেশে উৎপন্ন পাটই ছিলো প্রধান রপ্তানি পণ্য। আমদানি খাতে পঞ্চিম পাকিস্তানের জন্য ব্যয় করা হয়েছিলো ২৯ হাজার ৬২৯ মিলিয়ন টাকা।অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একই সময়ে আমদানি করা হয়েছিলো ১৭ হাজার ৬৭ বিলিয়ন টাকা। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিলো অনেক বেশি। এসব তথ্য ১৯৭০ সালে করাচি থেকে প্রকাশিত মান্থলি ফরেন ট্রেড স্ট্যাটিসটিক্স থেকে পাওয়া গেছে। বিডিনিউজ ২৮ জানুয়ারি ২০২১ এ উল্লেখ করা হয়েছে " অনেক অর্থনীতিবিদের মতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা অর্থে পরিমাণ ছিলো ২ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার ---।

দেশের মুক্তিকামী মানুষের কাছে দ্রçতেই পৌঁছে গেলো বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা। এদিকে হানাদার পাকিস্তানীরা বসে নেই। রাজনৈতিক কুটচালের পাশাপাশি এ ভ‚খন্ডে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলো। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে কাপুরুষের মতো ঝাপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশের নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর। তারা ঢাকায় অসংখ্য সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী,পুলিশ ও ইপিআর সদস্যকে হত্যা করে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেফতারের পূর্বে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।স্বাধীনতার ঘোষণায় তিনি দেশের সর্বস্তরে জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানান। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চ‚ড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত জনগনকে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা দেন।প্রথমদিকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মুক্তিকামী মানুষের নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলা হয়।এরপর সবাই সংগঠিত হতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের সরকার গঠনের ঘোষণা আসে।এতেকরে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশের সাধারণ মানুষের মনোবল অনেক বেড়ে যায়।এরপরই পরিকল্পিত ভাবে যুদ্ধের শুরুহয়।বাংলাদেশ সরকারের আহবানে তৎকালীন বন্ধুপ্রতিম ভারত সরকার ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি সুবিধাজনক জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে। বাস্তচ‚ত শরনার্থীদের সীমান্তের ওপারে থাকা খাওয়ার ব্যবস্হা করে।প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্বের সকল দেশের প্রতি বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বকৃীত দেওয়ার আহবান জানানো হয়।প্রবাসী বাংলাদেশীরাও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিদেশে জনমত সৃষ্টিসহ নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। দেশের মধ্যে তখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার এদেশীয় দোসরদের বিরুদ্ধে বিরামহীন লড়াই করে যাচ্ছে আমাদের সূর্য সন্তানেরা।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের আনুষ্ঠানিক শপথ নেওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অর্থাৎ ১৮ এপ্রিল কলকাতার পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনার মোহাম্মদ হোসেন আলীর নেতৃত্বে হাইকমিশনের সব বাঙালি কর্মকর্তা - কর্মচারী একযোগে

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তাঁরা পাকিস্তান ডেপুটি হাইকমিশন' নাম ফলক নামিয়ে সেখানে 'বাঙলা দেশ কুটনৈতিক মিশন' নাম ফলক লাগিয়ে দেন ।যা ছিলো এ সে সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মিশনের ছাদে ওড়ানো হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের পতাকা উড়তে শুরু করে। ১৯৭১ সালের নভেম্বরের মধ্যে ১৯ টি মিশনের ১১৫ জন কর্মকর্তা - কর্মচারী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে এক সমুদ্র রক্তের বিনিময়ে অবশেষে এলো আমাদের বহু প্রতিক্ষিত ও কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের স্বাধীনতা।দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে কতিপয় রাজাকার, আলশামস, আলবদর ছাড়া ক্ষতি হয়নি এমন কোন পরিবার এ দেশে ছিল না।কতো রকম অত্যাচার নিপীড়নের স্বীকার হয়েছিলো তখনকার মানুষগুলো যা এ প্রজন্ম কল্পনাও করতে পারবেনা।মুক্তিযুদ্ধে মা হারিয়েছে তার সন্তানকে,বোন হারিয়েছে ভাইকে, পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নিয়ে গেছে আদরের ছোট বোনটিকে,যাবার সময় জ্বালিয়ে দিয়েছে ঘর-বাড়ি, ফসলের মাঠ,ধ্বংস করছে ব্রিজ কালভার্ট।কি করেনি তারা এ কথা ভাবলেও বুক কেঁপে ওঠে।

জীবনের শেষ প্রান্তে আজ আমি।প্রতি সপ্তাহে কোন না কোন সহযোদ্ধাকে বিদায় দিতে হয়।মনভারি হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে হিসাব মেলানোর চেষ্টা করি কি স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম।আমাদের সেই স্বপ্নের কতোটুকু বাস্তবায়িত হলো।আমি আশাবাদী মানুষ। আমার স্বপ্ন অনেক।চেয়ে ছিলাম ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্নীতি মুক্ত দেশ।দুর্নীতি মুক্ত দেশ দেখে যেতে হয়তো পারব না। এটা আমার কষ্ট।তবে দেশে এখন খাবার কষ্ট নেই, সবাই তিন বেলা খাবার পাচ্ছে এটা ভাবতে খুব ভালো লাগে। ৭০-৮০ দশক এমনকি ৯০ এর দশকেও খাবারের কষ্ট ছিলো, মংঙ্গা ছিলো।দেশের মানুষ এখন শতভাগ বিদ্যুৎ পাচ্ছে, রাস্তা - ঘাটের ব্যপক উন্নয়ন হয়েছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।পদ্মার উপর সেতু হবে এটা ছিলো আমাদের কল্পনারও বাইরে। দেখে এসেছি পদ্মা সেতু।শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। এসবই আমাদের উন্নতির লক্ষণ। মুক্তিযোদ্ধারা সন্মানি ভাতা পাচ্ছেন, গৃহহীনরা বিনামূল্যে ঘরবাড়ি পাচ্ছেন।সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় কয়েক কোটি মানুষ সুবিধা পাচ্ছে। এসব দেখে আমি খুশি হই।এক জীবনে আর কি চাইতে পারি।ফজরের নামাজের পর হাটাহাটি করা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস।হাটা শেষে যখন বাসায় ফিরি তখন দেখি মায়েরা তাদের ছোটো ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে স্কুলে ছুটছে। আমার দেখতে খুব ভালো লাগে। আমি দেখতে পাই আমার স্বপ্ন ঐ ছোট্ট দাদু ভাইয়ের মাঝে। যে স্বপ্ন আমাদের জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত হলো না,সেটা আমাদের নতুন প্রজন্ম নিশ্চয়ই বাস্তবায়ন করবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

জীবনের শেষ স্টেশনে দাড়িয়ে আছি, শেষ গাড়ির অপেক্ষায়। আশাবাদী মানুষ হিসেবে আমার কোন অপূর্ণতা নেই।নতুন প্রজন্মকে আমার আর্শীবাদ তোদের হাতেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে।আমিসহ সকল মুক্তিযোদ্ধারা উপরে থেকে সেটা দেখা খুশি হবো।সবার কাছে একটাই চাওয়া জীবনের সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতিমুক্ত থাকবে, মানুষকে ভালোবাসবে। বিজয়ের এই মাসে দেশবাসীকে বিজয়ী সালাম ও শুভকামনা।

#

পিআইডি ফিচার